প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৩৬২

প্রকাশক
নাজমুল হক
অনিন্দ্য প্রকাশন
২৪৪ নবাবপুর রোড ঢাকা ১

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ খালিদ আহসান

মুদ্রাকর
এম. হক
মডার্ণ টাইপ ফাউণ্ডার্স
প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স লিমিটেড
২৪৪ নবাবপুর রোড ঢাকা ১

পরিবেশক
নওরোজ সাহিত্য সংসদ
৪৬ বাংলাবাজার ঢাকা ১
স্টুডেন্ট ওয়েজ
৯ বাংলাবাজার ঢাকা ১

'হজিয়া'র পরিচালক তানভীর মোকাম্মেল
'আগামী'র পরিচালক মোরশেদুল ইসলাম

নিরঞ্জনের পৃথিবী

পৃথিবী যে স্থির নয়, সে-কথা আমি আগেও জানতাম।
সূর্যকে কেন্দ্র ক'রে মহাশূন্যের কক্ষপথে সে ঘুরছে।
পৃথিবী হচ্ছে অন্ধকার ম্যাজিক-মঞ্চে কালো সুতো দিয়ে
ঝুলিয়ে রাখা, উত্তর-দক্ষিণে চাপা এক কৃষ্ণ-কমলালেবু।
কালো সুতোটা সাধারণের চর্মচোখে দেখা যায় না, কিন্তু আছে।

আমি যখন পৃথিবীর দিকে তাকাই, তখন দেখি
ফলের দোকানের সুতো-বাঁধা আপেলের মতো পৃথিবী ঝুলছে।
আমি পৃথিবীর মুখ দেখতে পাই। কখনো প্রসন্ন, কখনো বিষণ্ণ।
পৃথিবী নিরঞ্জনের মতো। নিরঞ্জন আমার ছেলেবেলার বন্ধু।
আমাদের বাড়ির পেছনের গভীর জঙ্গলে, শনিবারের সন্ধ্যায়,
বাঁশরাজ গাছের উঁচুডালে নিরঞ্জন ফাঁসি নিয়েছিল।
তার ঝুলন্ত লাশ আমরা আবিষ্কার করেছিলাম পরদিন ভোরে।
দড়ি খুলে নামিয়ে না-আনা পর্যন্ত নিরঞ্জন মহাশূন্যে পৃথিবীর
মতো
ঝু
ল
ছি
ল...।

পৃথিবী মহাশূন্যের সেই অভিমানী পুত্র, নিরঞ্জন।
পার্থক্য এই, নিরঞ্জনের দড়িটা তাকালেই দেখা যায়,
পৃথিবীর ফাঁসির দড়িটা অদৃশ্য; তা দেখা যায় না চর্মচোখে।
কিন্তু, খুব গভীর-নিমগ্ন-অন্তর্ভেদী চোখে তাকালে দেখা যায়।

আমি যখন পৃথিবীর দিকে তাকাই, পৃথিবী নড়ে ওঠে।
আমি নগ্নযুগলপায়ে আঁকড়ে ধরি পায়ের নিচের মাটি;
তখন পৃথিবী আমার পায়ে পৃথিবীর-জুতো পরিয়ে দেয়।

মানুষের বাসযোগ্য কিনা তা জরীপ ক'রে দেখার জন্যই
আমি এসেছিলাম এই পৃথিবীতে—
যেমন মানুষ জরীপ করতে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে যায়।

প্রজ্বলন্ত দাউ-দাউ অগ্নিকুণ্ডের ভিতর থেকে আমি বেরিয়ে
এসেছিলাম লাল টকটকে লৌহপিণ্ডের কমলালেবুর মতো।
দুর্ধর্ষ অভিযাত্রীর কৌতূহলী চোখ নিয়ে অতঃপর
আমি প্রদক্ষিণ করেছি পৃথিবী নামের এই ক্ষুদ্র-দ্বীপটিকে।

ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের প্রিয়-পৃথিবী
মোটামুটিভাবে বলতে পারি, আমার ভালোই লেগেছে।
সে চির-নবীনা, শস্য-শ্যামলা, উর্বরা এবং কামার্ত।
কিন্তু সে বড্ডবেশি স্বার্থপর, অহংকারী, জেদী এবং আত্মমগ্ন।
এর সঙ্গে সম্বন্ধ গড়বার কথা আমার বেশ মনে থাকবে।
তা সত্ত্বেও, আপনাদের পৃথিবী আমার বাসযোগ্য মনে হয় নি।
তাই, আমি যেখান থেকে এসেছিলাম, সেখানেই ফিরে যাচ্ছি।

ফিরে যাবার আগে, নিরঞ্জনের অকথিত বেদনার কথা ভেবে
আমি পৃথিবীর ফাঁসির-গিটটা একটু সামান্য
ঢিলা ক'রে দিয়ে গেলাম,
যাতে আপনারা তার মুক্ত-মুখের কিছু প্রয়োজনীয় কথা
শুনতে পারেন।
নানাকারণে যা সে আগে কখনো বলতে পারে নি।

আমি আবার আসবো, পৃথিবীর কোমল মৃত্তিকায় রেখে-যাওয়া
আমার ভালোবাসার পদচিহ্নের টানে। এখন বিদায়...।

বাংলাবাজারে পূর্ণিমা

আকাশে কী মেৎকার চাঁদ। বিউটি বোর্ডিং-এর ছাদ বেয়ে
ট্যাংকের জলের মতো গড়িয়ে পড়ছে সোনার জ্যোৎস্না।
আজ রাতে বাংলাবাজারের পথে পথে চাঁদ-কুড়ানোর ধুম।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'চাঁদের অমাবস্যা'
'পাণ্ডুলিপি'র স্বর্ণমন্দির ছেড়ে উড়ে গেছে দূরের প্যারীসে।
প্যারীদাস রোডে, বুড়িগঙ্গার বুকে আজ চাঁদের পূর্ণিমা।

চৈত্র আসতে এখনো ঢের বাকি, কিন্তু এর মধ্যেই
চাঁদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বইতে শুরু করেছে মাতাল হাওয়া।
একা চাঁদে রক্ষা নেই, তার উপর রবীন্দ্রনাথের গান :
'দখিন হাওয়া জাগো জাগো।'

এরকম রাতে, চাঁদের হুইস্কি পান ক'রে মাতাল হয়েছে
পুরনো ঢাকার কবি।
চেয়ার পেতে খোলাগায়ে তিনি বসেছেন খোলা আকাশের নিচে।
বুঝি এমন রাতেই তারে বলা যায়...কী বলা যায় ?

ভালোবাসা আমাকেও বেশ ভুগিয়েছে

মাঝে-মধ্যে, হঠাৎ-সহসা কেন যে জানি না,
বুকের ভিতরে, খুব-অভ্যন্তরে, গভীরে কোথাও,
যে-স্থানটির নাম আজও স্থির ক'রে উঠতে
পারে নি মানুষ; আর সুনির্দিষ্ট কোনো নাম
না-থাকার জন্যই যে-স্থানের রহস্যটুকু
কোনোদিনই ঘুচবার নয়—অর্থাৎ কোনো অনির্দিষ্টকে
ধরবার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কোনো শব্দ যেখানে
সবচেয়ে বেশি ব্যর্থ হয়, সেই চিররহস্যাবৃত,
চির-অধরা মনের ভিতরে—
মাঝে-মধ্যে, হঠাৎ-সহসা কেন যে জানি না,
বুকের ভিতরে, খুব-অভ্যন্তরে, গভীরে কোথাও,
আমি অনুভব করি এক অস্ফুট আবেগ—
সে-আবেগের নাম আজও স্থির ক'রে উঠতে
পারে নি মানুষ; আর সুনির্দিষ্ট কোনো নাম
না-থাকার জন্যই যে-আবেগের রহস্যটুকু
কোনোদিনই ঘুচবার নয়—অর্থাৎ কোনো অনির্দিষ্টকে
ধরবার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কোনো শব্দ যেখানে
সবচেয়ে বেশি ব্যর্থ হয়, সেই চিররহস্যাবৃত,
চির-অধরা প্রেমের ভিতরে—
মাঝে-মধ্যে, হঠাৎ-সহসা কেন যে জানি না,
বুকের ভিতরে, খুব-অভ্যন্তরে, গভীরে কোথাও,
তুমি এসে জীবনের মূল ধ'রে নাড়া দিয়ে যাও।

হয়তো সবার ক্ষেত্রে এ-রকমই হয়,
ওটা কাব্য ক'রে বলবার কথা নয়।
আমিও মানি সেই সহজ-সরল সত্যটা।
তবু কেন কাব্য ক'রে বলি? বলি এ-জন্য যে,
অন্যসবার ক্ষেত্রে যা হয়, আমার ক্ষেত্রে তো
তার কিছু ব্যতিক্রমও হ'তে পারতো।
কিন্তু তা হয় নি।

ভালোবাসা আমাকেও বেশ ভুগিয়েছে।

বিক্রির জন্য নয়

তুমি আমার কী উদ্বোধন করবে বলো !
আমি চাই আজ তোমার হাতে আমারও
কিছু-একটার উদ্বোধন হোক।

আমার তো কোনো চিত্রকর্ম নেই,
নেই অয়েল-পেইন্টিং, কোলাজ-কার্টুন,
এমনকি নয় সিরামিক মৃৎপাত্র কোনো।
কবিতা কি দর্শনীয় ? কাটা-ছেঁড়া পাণ্ডুলিপি ?
শব্দের বর্নিলবিভা, রঙিন-ঐশ্বর্য আছে মানি,
তবু সে অমূর্ত মূর্তি, যদিও তা হৃদয়সংবেদী
দৃষ্টিকে করে না তৃপ্ত ক্যানভাসে ছবির মতন।

অথচ আমি চাই তোমাদের পাশাপাশি
আজ আমারও কিছু-একটার উদ্বোধন হোক।
তুমি আমার কী উদ্বোধন করবে বলো !
আমি চাই তুমি ফিতে-কেটে আমাকে দেখাও।
জয়নুলের এই সংগ্রহশালায় আজ
আমারও কিছু-একটার প্রদর্শনী হোক।

ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মতন সযত্নে পেরেক ঠুকে
তোমার ছবির পাশে আমাকে ঝুলিয়ে দাও।
এই শুষ্কপ্রায় ব্রহ্মপুত্রের তীরে
আমি মাথানত ক'রে আজ অশ্রুপাত করি।
সবাই দেখুক আমার চোখের জলের বর্ণচ্ছটা।

তিতাস-গ্যাসের মতো আমার প্রজ্বলনের তৃষ্ণাকে
তুমি উদ্বোধন করো।
শালির জেব্রার মতো আমাকে পোড়াও।
আমার যে-চোখে কামুক দৃষ্টি, তাকে
পুঁইশাকের বিচির মতো ভেঙে গলিয়ে দাও।
সে তার নিজস্ব বর্ণ নিয়ে, স্বমহিমায়
উন্মোচিত হোক, উদ্বোধিত হোক।

কিন্তু আমার বুকের ভিতরে পেরেক ঠুকো না—
ওখানে রয়েছে সমস্ত শিল্পের উৎস,
আমার অমূল্য পুতুলসমূহ।

ছবির নিচে কোনো নির্দিষ্ট নামের
প্রয়োজন নেই—
শুধু আমার পায়ের তলায় লিখে দিও :
'বিক্রির জন্য নয়'।

অরূপ সুন্দর

যতক্ষণ জেগে থাকি, দরোজাটা বন্ধ করি না।
কেবলই মনে হয় কেউ একজন আসবে।
আমার প্রত্যাশায় এমন একজন নারী আছে,
কোনো শিল্পী যাকে আঁকতে পারে নি।
লিওনার্দো দা ভিঞ্চি
আঁরি মাতিস
পাবলো পিকাসো অথবা যামিনী রায়,
কেউ-ই আঁকতে পারে নি তাকে।

মারকন্যার উদাস দৃষ্টির মধ্যে মুহূর্তের জন্য
আমি তাকে মূর্ত হতে দেখেছিলাম খাজুরাহে।
আমার বাবার আঁকা একটি জলরং ছবির ভিতরে
আমি খুঁজে পেয়েছিলাম তার
পেছন-ফিরে তাকানোর উদ্দীপক সলজ্জ ভঙ্গিটি।
যদিও জানি সে-ছবির মডেল ছিলেন
আমার সিক্ত-বসনা মাতা, আমার জননী।

এইভাবে কুড়িয়ে পাওয়া খণ্ড-খণ্ড দৃশ্যগুলোকে
মালার মতো গেঁথে যদি তাকে আঁকা যায়,
আমার মনে হয় না তাতেও খুব একটা লাভ হবে।
কেননা, শিল্পমাত্রই তো অনুকৃতি, বাস্তবের।
অথচ আমি যার কথা ভাবি,
যার জন্য অন্ধকারের দুয়ার খুলে দিয়ে
বসে থাকি অপেক্ষায়—
তাকে আমি কোনোদিন বাইরে দেখি নি।
তাই, কেমন ক'রে বলি তাকে কেমনতরো দেখায়?

সে-তো গাছের ফুলের মতো নয়,
সে-তো আকাশের বৃষ্টি ভেজা
সহজলভ্য চাঁদের মতো নয়।
সে অন্যরকম। ভীষণ অন্যরকম।

তার যুগলস্তনের দর্পে মাথা কোটে
অরণ্য-পর্বত।
তার উড়ন্ত ঊরুযুগে পদানত
মেঘের উর্বশী।
প্রজননের সঙ্গে অসম্পৃক্ত তার গর্ভদেশ।
তার যুগলব্যাকুলবাহু
পুরুষকে আলিঙ্গনে জড়িয়ে রাখা ছাড়া
আর কোনো জাগতিক কর্তব্য শিখে নি।

আমি চাই সে আমার জাগরণের মধ্যে আসুক।
কারো কন্যারূপে নয়, কারো ভগিনীরূপে নয়,
কারো বধূরূপে নয়, কারো মাতৃরূপে নয়।
জগৎ-সংসারের সকল বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে
সে আসুক, স্বয়ম্ভূ সুন্দর।

সে যখন সম্পূর্ণ নিরাভরণ, তখনও যেমন
উলঙ্গতার আচ্ছাদনে সে চিরআবৃতা—
তেমনি, যখন সে কল্পনার অন্ধকারে ছায়াবৃতা;
তখনও আমার দৃষ্টির মধ্যে সে চির-নগ্ন।
আমি বাঞ্ছা করি সেই চির-নায়িকাকে।

যতক্ষণ জেগে থাকি, দরোজাটা বন্ধ করি না।
মন বলে সে আসবে।
আমি চাই না, সে আমার নিদ্রার মধ্যে আসুক,
আর আমি নিদ্রাশেষে, জাগরণে
তার চ'লে যাওয়ার বেদনায় অশ্রুপাত করি।

ভালোবাসা, ভারসাম্যহীন

বাঁশির কাছে যে-সুরের প্রত্যাশা
সে-প্রত্যাশা পূর্ণ না-হওয়া পর্যন্ত
আমি আমার বাঁশিটি বাজাতে চাই।
যে-পর্যন্ত স্খলিত হয় না বীর্য
সে-পর্যন্তই জীবের সঙ্গম।
জয়ী না-হওয়া পর্যন্ত
আমি পরাভবকে স্বীকার করি না।

ভালো না-বেসেই যদি ভালোবাসা পাই,
ভাবি, কী লাভ তাহলে পন্ডশ্রমে?
যে-প্রেম ফাঁকি দিতে জানে
তার বাকি শোধ হয় না জীবনে।
যে-প্রেমে ঘাটতি নেই
সে-তো বুদ্ধিমান গৃহীর প্রণয়—
সে আমার নয়।

আমার ভালোবাসা ভারসাম্যহীন,
উঁচু-নিচু, ভাঙা-চোরা, খানাখন্দময়।

সুন্দর আর কতদূর

সুন্দর আর কতদূরে ?
লিখতে-লিখতে, কাটতে-কাটতে দিন গেছে।
রাতের সুন্দর বাতিল করেছি ভোরে।
আবার বসেছি আঁকতে নতুন উদ্যমে।

হয় না, যা-আঁকতে চাই, তার অনেকটাই
থেকে যায় অভ্যন্তরে, মনের ভিতরে।
একেকবার রেগে যাই, বলি, যথেষ্ট হয়েছে।
পর-মুহূর্তেই ধরা পড়ে আত্ম-প্রতারণা।
মন বলে, কী বিচ্ছিরি, এ-তো কিছুই হলো না।
ব্যর্থ, ব্যর্থ, ব্যর্থ। বৃথাচেষ্টা। সব পণ্ডশ্রম।

কাগজে-কলমে, শব্দে-রেখায়, রঙের তুলিতে ফের
বুক ঘষি প্রাণপণে ঊষর মাটিতে।
আর কতদূরে সুন্দর ?

আকাশ

আমার সমস্ত ভাবনা যখন তোমাকে ছোঁয়,
আমার সমস্ত উপলব্ধি যখন তোমার
আত্মাকে স্পর্শ করে, আমার সমস্ত বোধ
যখন তোমার বোধিতে নিমজ্জিত হয়,
তখন আমার প্রাণের গভীর থেকে
স্বতঃস্ফূর্ত মোহন মন্ত্রের মতো উচ্চারিত হয়
একটি অত্যন্ত সহজ শব্দ,……আকাশ।

আমি শব্দটিকে ক্রমাগত উচ্চারণ করি।
জানি না কেন এই শব্দটিই শুধু
এতো বারবার ঘুরে-ঘুরে আসে।
কী পেয়েছে সে আমার ভিতরে ?

আমি লক্ষ্য করেছি, আকাশ শব্দটি
উচ্চারিত হওয়ার পরে আমার ভিতরে
আর কোনো কষ্টই অবশিষ্ট থাকে না।
যেন যুদ্ধের স্মৃতি-বুলেটের মতো
আমার বুকের ভিতরে গেঁথে ছিল
এই যন্ত্রণাক্ত আকাশ শব্দটি।

তোমার আমার মাঝে
আছে এরকম অনেক আকাশ।
আমি ব্যর্থ-প্রেমিকের মতো মুগ্ধমূর্খচোখে
কেবল তাকিয়ে থাকি আকাশের দিকে।

ফাঁকি

১

মিথ্যে হচ্ছে খাদ, সত্য হচ্ছে সোনা।
জীবন হচ্ছে অলংকার —সে খাদও নয়,
সে সোনাও নয় পুরোপুরি।

কবি হচ্ছেন কারিগর, স্বর্ণ-শিল্পী;
তার হাতে অলংকৃত হয় মনুষ্যজীবন।
তাই, শুধু সত্যে তার চলতে পারে না,
মাঝে-মাঝে তাকে নিতে হয় মিথ্যের আশ্রয়।

কবি যখন বলেন ভালবাসি,
তখন ভাববে ,কথাটা সোনার মতই সত্য।
কবি যখন বলেন ভালবাসি না,
তখন ভাববে কথাটা খাদের মতই মিথ্যে।

২

কে বলেছে আমার চোখের জল ঝরে না ?
বুকের ভিতরে তোমার মুখ
বালিশচাপা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।
সকালে উঠেই দেখি
চোখের জলে ডুবে গেছে তাবৎ পৃথিবী।
না,না, এ-নির্ঘাৎ তোমার চোখের জল।

৩

আচ্ছা, আমি মদ না-খেয়েই যদি
মাতলামি করতাম পথে-পথে,
যদি কাঁদতাম তোমার নাম ধ'রে
তাহলে কাজটা কি খুব ভালো হতো ?
লোকে তো নিন্দা করতো তোমারই।

এখন সবাই নিন্দা করছে আমাকে,
ভাবছে, লোকটা মাতলামো করছে মদের জন্য।

আমার ঘরের তালাটিকে

আমি আমার ঘরের তালাটির জন্য এখন কষ্ট পাই।
প্রভুভক্ত কুকুরের মতো সে আমার ঘরের দরোজা
আগলে বসে থাকে, শুধু আমার জন্য। আমার জন্য।
যখন আমি ঘরে ফিরি, আমার মাতাল চাবির ছোঁয়ায়
যখন খুলে যায় তার অপেক্ষাকাতর শরীর, তখন, তখন
আমার সঙ্গে-সঙ্গে সে-ও প্রবেশ করে ঘরের ভিতরে।

অভ্যাসবশত আমি তাকে ছুঁড়ে ফেলি আমার শয্যায়,
দেখি, লোহাও সংস্কার খুব সুন্দর হতে পারে।

প্রেম

আমিও আছি—
তুমিও আছো সুখে।
তুমিও আছো—
আমিও আছি সুখে।

আমিও নেই—
তুমিও নেই সুখে।
তুমিও নেই—
আমিও নেই সুখে।

স্বপ্ন ও বাস্তব

অনন্ত রাত্রির কোলে জেগে উঠিলাম।
আচ্ছন্ন স্বপ্নের ঘোরে দেখিলাম
অপসৃয়মান নগ্ন-ছায়াবৃতা,
এ-জীবন।

আমাকে জাগিয়ে দিয়ে ঘুম থেকে
জানালার খোলা-পর্দা দুলিয়ে হাওয়ায়
চ'লে যাচ্ছে অভ্রভেদী চকিতবিদ্যুৎ,
দূরাকাশে।

আধো-আলো, আধো-অন্ধকারে
কে কাহারে চেনে ?
তবুও বিহ্বল-দৃষ্টি মেলে ধ'রে
অন্ধকারে চেয়ে থাকি
কর্তব্যবিমূঢ়।

মাঝে-মাঝে মনে হয়—
এ-জীবন তবু মন্দ নয়, ভালো।
সমুদ্র মন্থন ক'রে তুমি তাতে
যত বিষ ঢালো,
সব বিষ শুষে নিয়ে প্রভাতের আলো
দেখা দেয় জানালায় খোলা-পর্দা
দুলিয়ে হাওয়ায়......

তারপর, একদিন ছলনার জাল ছিন্ন ক'রে
স্বপ্ন ও বাস্তব মিলে একসাথে ডুবে যায়
অন্তহীন আমার ভিতরে।

প্রতিটি আসার মাঝে সুপ্ত থাকে যাওয়া ;
বুঝিলাম এই সত্য প্রেমের নিষ্ঠুর
পরিচয়ে।

পুরুষের প্রতি

পুরুষ, তুমি নারীর সঙ্গে কী করেছো ?
নারী এমন জয়োল্লাসে হাসছে কেন ?

পুরুষ, তুমি নারীর সঙ্গে কী করেছো ?
নারী এমন অভিমানে কাঁদছে কেন ?

পুরুষ, তুমি নারীর সাথে কী করেছো ?

পুঁজিবাদ

এখন থেকে চায়ের সঙ্গে মাটন্-কাটলেট এবং আলুর চপ।
এই যে নয়ন, যা তো বাবা, দুটো দামী বিদেশী সিগারেট
নিয়ে আয় তো, আর কয়েকখিলি পান, বাবা-জর্দা দিয়ে।
আজ একেবারেই কিছু খরচ করতে পারি নি, বুঝলেন,
অথচ পকেটে গিজগিজ করছে একতারা কাগজের নোট।
টাকার আর কী দোষ বলুন, খরচ না হ'লে সে তো জমবেই।

আচ্ছা, আপনারা না লেনিন-জন্মোৎসব করছেন,
এই নিন, আমার চাঁদাটা রাখুন।
আরে না, না, ভাঙানোর কী দরকার ?
পুরোটাই রেখে দিন না---একশ'টা টাকা কী আর এমন ?
টাকাগুলো তো আর আমি সত্যি সত্যি কষ্ট ক'রে
কামাই করি না। আমার সব টাকাই আসছে কবিতা থেকে;
যে-কবিতাগুলি আমি লিখি খুব অনায়াসে।
ভিক্ষুকের পায়ে লক্ষ্মী, কবির লক্ষ্মী লেখায়।

একটা সময় ছিল যখন আকাশে মেঘ জমতো,
বুকের মধ্যে জমতো দুঃখ। আমি গুনগুন ক'রে গাইতাম :
'মেঘের 'পরে মেঘ জমেছে, আঁধার হয়ে আসে।'
এখন ঐ-গান আর কষ্ট ক'রে আমাকে গাইতে হয় না।
এখন ঐ-গান শুনি সদ্যকেনা রঙিন-টিভিতে
অথবা স্টেরিও কোসেটে।

একটা সময় ছিল, আমার পকেট ছিল শূন্য,
বক্ষ ছিল ব্যথায় পূর্ণ—
আকাশ ভরা ছিল কালো মেঘে।
এখন বর্ষা-ঋতুতেও আকাশে মেঘ দেখি না,
থাকলেও আমার চোখে পড়ে না।
এখন বুকটা কেমন যেন পূর্ণ-পূর্ণ লাগে।
রাজশাহী সিল্কের লালপাড় শাড়িতে জড়িয়ে

অন্নপূর্ণার মতো স্ত্রীকে সাজিয়ে রেখেছি ঘরে—
তাকে নতুন নাকপাশা দিয়েছি গড়িয়ে, স্বর্ণের।
ছোট্ট সুখী পরিবার নিয়ে সে এখন রানীর হালে আছে।
সম্প্রতি মীরপুর চিড়িয়াখানার সেই
বিখ্যাত গর্দভটি সমেত সবগুলো জন্তু-জানোয়ার
তাকে দেখিয়ে নিয়ে এসেছি ট্যাক্সি-ভাড়া ক'রে।
তবু অনেক টাকা এখনো পকেটে পড়ে আছে,
কিংকর্তব্যবিমূঢ়। অথচ এদিকে বাড়ি-ভাড়া ক্লীয়ার,
দোকানের পাওনা শোধ, মাসের চালডাল কেনা শেষ।
কারো কাছে ধার নেই, অনেকের কাছেই আমার পাওনা।
এখন আমি আমার পাওনাগুলো যোগ করি না ভয়ে।

এমনিতেই টাকার জ্বালায় বাঁচি না, তার উপরে
দু'দুটো অর্থকরী পুরস্কার এসে জুটেছে সম্প্রতি—
এতো টাকা দিয়ে আমি এখন কী করবো ?

ভগবানকেও বলি, এতো টাকাই যদি দিলে,
পুঁজিবাদের প্রতি একটু আস্থা দিলে না কেন ?

মনের পৃথিবী নিয়ে

বাইরের পৃথিবীটা বড়-বেশি ছোট, তার চারপাশে
চাঁদ-তারা গ্রহর দেয়াল।
আমি বাঁচি আমার মনের পৃথিবী নিয়ে।

বাইরের পৃথিবীটা বড়-বেশি কদর্য-কুৎসিত,
তার মৃগ-নাভি কুমী-কীটে ভরা।
আমি বাঁচি আমার মনের পৃথিবী নিয়ে।

বাইরের পৃথিবীটা বড়-বেশি কর্কশ নিষ্ঠুর,
আত্মমুগ্ধ অহংকারে সাধা,
আমি বাঁচি আমার মনের পৃথিবী নিয়ে।

বাইরের পৃথিবীটা বড়-বেশি স্বার্থপর, শস্ত্রজীবী,
বড়-বেশি হিংসাপরায়ণ,
আমি বাঁচি আমার মনের পৃথিবী নিয়ে।

বাইরের পৃথিবীটা রক্তহীন মুমূর্ষু পাণ্ডুর,
বড়-বেশি স্বপ্নভ্রষ্ট আকীর্ণকণ্টক।
আমি বাঁচি আমার মনের পৃথিবী নিয়ে।

বাইরের পৃথিবীটা দুঃখজরাব্যাধিমৃত্যুময়,
আমি বাঁচি আমার মনের পৃথিবী নিয়ে।

বাইরের পৃথিবীটা বড়-বেশি স্বাধীনতাহীন,
আমি বাঁচি আমার মনের পৃথিবী নিয়ে।

পঁচিশে বৈশাখ

কাল ছিল পঁচিশে বৈশাখ,
আজ কত তারিখ জানি না।
'নয়ন ভরিয়া দেখি'—এই শিরোনামে
একাডেমী-মঞ্চ মুখরিত; আবৃত্তিতে,
বক্তৃতায়, গানে। সামনে জনতা যেন
সমাহিত কুঁদিত পাষাণ, মুখোমুখি
রবীন্দ্রনাথের।

প্রাণখুলে কবি গাইছেন
অন্তহীন অনন্তের গান।
যেন এই প্রথমবারের মতো
পৃথিবীতে গীত হলো রবীন্দ্রসঙ্গীত।

কাল ছিল পঁচিশে বৈশাখ,
আজ কত তারিখ জানি না।

আমার পুরস্কৃত হওয়ার ব্যাপারটি

আমি একটি সিদ্ধান্তে পেঁাছেছি, পৃথিবীতে কবিতা আছে মোট দুরকমের: পাওয়ার কবিতা, আর না-পাওয়ার কবিতা। সম্ভবত এরকম কোনো বিবেচনা থেকেই কীটস্ নামের জনৈক ইংরেজ কবি একথা বলেছিলেন: 'পৃথিবীতে কবিতার শেষ নেই।'

এ-পর্যন্ত লিখেই আমাকে থামতে হলো, পৃথিবীতে কোন্ ধরনের কবিতা বেশি লেখা হয়েছে বা হচ্ছে, তা ভেবে দেখতে। অভ্যাসবশতঃ হাত চলে গিয়েছিল এ. টি. দেবের 'শব্দবোধ অভিধানে'—ওখানে সে হিসেবটা তো থাকবার কথা নয়।

মনে হয়, এর সদুত্তর দিতে পারতো জাতিসংঘ, যদি না সে থাকতো বিশ্বজুড়ে যুদ্ধদমনে ব্যস্ত। পৃথিবীর সবগুলো দেশ ঘুরে বেড়াবার সুযোগ পেলে, স্থানীয় তদন্ত সাপেক্ষে, হয়তো আমিও পারতাম এই জটিল প্রশ্নের সদুত্তর রেখে যেতে।

তবে, এ-বছর বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার (কবিতা) পেয়েছি বলেই বলছি না, আমি আমার সাম্প্রতিক রাশিয়া, ভিয়েতনাম এবং কাম্পুচিয়া ভ্রমণের অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি—পৃথিবীতে পাওয়ার কবিতাগুলিই এখন জনস্রোতে এগিয়ে চলেছে।

সেদিক থেকে আমার পুরস্কৃত হওয়ার ব্যাপারটি মোটেও বিচ্ছিন্ন কোনো আশ্চর্য ঘটনা নয়।

পুরস্কার

ছিলছাম ছোট্ট শহরের সঙ্গে মানানসই দ্বিতল হোটেল,
শহরের শেষ-প্রান্তে।
শহরের নাম ফহ্‌দপুর, হোটেলের নাম শ্যামলী।
শ্যামলীর পাশ দিয়ে বয়ে-যাওয়া
নদীটির নাম মনে নেই,
আমার সমস্ত স্মরণ জুড়ে আছে শুধু রেণুবালার নাম
অমোচনীয় কালির হরফে।

জানি, এই কবিতা পড়বে না রেণুবালার চোখে।
রেণুবালা পড়তে শিখে নি। তাই, কোনদিনই জানবে না,
'আলাওল' পুরস্কারে ধন্য হতে এসে
একদিন এই সাধারণ কবি ওর কালো-হরিণীর রূপে
কী অসাধারণ হয়ে উঠেছিল।

যুবতীর বেশে, ঝাড়ু-হাতে সে এসেছিল
পুরস্কৃত কবির ঘর পরিচ্ছন্ন রাখার
বিশেষ দায়িত্ব নিয়ে।
ঘরে ঢুকেই অপরিচ্ছন্ন কবিকে সে-কথা সে জানিয়ে দিলো
তার শাসন-মাখা টানা-চোখের দুর্লভ চাহনিতে।

কালো মুখের সাথে পাল্লা দিয়ে
রাধাচূড়া হয়ে ফুটেছিল ওর কালো চুলের খোঁপা।
লতার মতো গা-পেঁচানো ডোরাকাটা শাড়ির তলায়
পুষ্টধানের গোছার মতো তার আলতামাখা পা-দুটো
ঢেউ খেলানো ঘরের মেঝেতে ফুটেছিল যেন
দেবী-পায়ের যুগলপদ্ম।
ওর কালো নাকে রূপোর সাদা-নথটি জ্বলেছিল
যেন কৃষ্ণ-গাঁদায় টলটলে ভোরের শিশির।

'কী নাম তোমার ?'
প্রশ্নটা ছিল পূর্বাহ্নেই ফাঁস হয়ে যাওয়া
একেবারে জানা কথার মতো।

তাই, স্বাভাবিকভাবেই, উত্তরটা হলো বিলম্বিত।
রেণুবালা তার নাম বললো না।
কিন্তু প্রশ্নের আড়ালে যে-প্রশ্নটি ছিল লুকিয়ে,
সেই প্রশ্নেরই উত্তর দিলো সে
তার চঞ্চল মুখের অচঞ্চল মুচকি-হাসিতে।

সঙ্গে ছিল বন্ধু দুইজন। তাই, নিভৃতে হ'লে
কী জবাব হতো সেই প্রশ্নের, তা জানবার
আর কোনো উপায় ছিল না।

রেণুবালা দাঁড়ালো দেয়ালে হেলান দিয়ে।
মনে হলো, কালোমেঘের আড়ালে ঢাকা পড়েছে
সাদা চুনকাম করা ভোরের আকাশ।
ওর বুক-কাঁপানো হাসি, আর সুখ-জাগানো চোখের
মোহিনী ইশারায়
কোথায় ভেসে গেলো আমার আলাওল।

রেণুবালা নিজের মুখে উচ্চারণ করলো ওর নাম।
জ্যা-মুক্ত তীরের মতো সেই নাম ছুটে এসে
বসে গেলো আমার বুকের ভিতরে।
মনে হলো, যদি না-জানতাম, তবুও নির্ঘাৎ
এ-নামই আমি দিতাম ওকে।
ভালোই হলো, আমার কল্পনার নামের সঙ্গে
মিলে গেলো ওর বাস্তবের নাম।

কিছু-একটা স্মৃতির কাঁটায় ওকে জড়াতে চাইলো মন।
কী দিয়ে জড়াতে পারি ? আমার কী আছে এমন ?
চোখ পড়লো সদ্যকেনা, সদ্যস্নাত লাক্স-সাবানে।
আমার অপ্রকাশিত কামনার শুভ্রশিখা
প্রকাশিত হবে ওর সাঁওতাল-কালো দেহে।
এই ভেবে, বিদায় উদ্যত রেণুবালকে বললাম :
'দাঁড়াও, আমার পুরস্কার তো আমি পেয়েছি,
এই নাও তোমার পুরস্কার। আহা, ধরোই না।'

রেণুবালা আমাকে গ্রহণ করলো সলজ্জ-দ্বিধায়।

প্রিণ্ট-অর্ডার ১৯৮৪

প্রুফ কেটে-কেটে কেটে গেছে দিন,
এখনো হয় নি প্রিণ্ট-অর্ডার দেয়া।
ক্ষেপে গেছে প্রেস, সেই সাথে প্রকাশক।

অফসেটে ছাপা প্রচ্ছদ ছিল রেডী,
সুচে সুতো বেঁধে তৈরী ছিল বাঁধাই মিস্তিরী
গীতাঞ্জলির মতন বাঁধবে ব'লে।

ক্লান্ত হয়েছে পাঠকও কবির নতুন গ্রন্থ খুঁজে।
গ্রন্থমেলা সে-ও প্রায় তুঙ্গ স্পর্শ ক'রে
ডুবেছে অস্তাচলে। কিন্তু হলো না, হলো না।

প্রুফ কেটে-কেটে কেটেছে ফেব্রুয়ারি,
এখনো হয় নি প্রিণ্ট-অর্ডার দেয়া।

একটি জনসঙ্গীত

আমরাও নই এতো ক্ষুদ্র,
আমাদের হাসি গানে
প্রবাহিত হয় প্রাণে
মুক্তির একই সমুদ্র।

আমাদেরও আছে নীল
সাগরের সাথে মিল।
তাই তার ঢেউ নিয়ে বক্ষে
আমরাও ধাই একই লক্ষ্যে;
মিলাই ব্রাহ্মণ ও শূদ্র।

আমরাও দুর্বার আঘাতে
যৌবনকেই চাই জাগাতে।
অন্যায় আবৃত বিশ্বের
ক্রন্দনরব শুনে নিঃস্বের
আমরাও হতে চাই রুদ্র।

আঁধারআকীর্ণ বিশ্বে

আঁধারআকীর্ণবিশ্বে
যেখানেই খুঁজে পাই আলো,
ছুটে গিয়ে পতঙ্গের মতো
জড়াই পাখায়, বলি :
'সেই ভালো, সেই ভালো।'

দগ্ধ হোক, তবুও অন্তত
একটি স্ফুলিঙ্গ যদি জ্বালে ;
অন্ধকার তাড়াতে তাড়াতে
পৌঁছে যাবো নতুন সকালে।

তাতেই আমার লাভ,
রক্ষা হবে পতঙ্গ-স্বভাব।

কবিতার মৃত্যু নেই,
অমরত্ব কাব্যের অধীন।
বিরূপে যেখানে নিত্য
অপরূপে সাজে,
আমার নতুন জন্ম
হবে তার মাঝে।

কলমের গান

বন্ধু আমার কলম আমার সোনা,
কথা শোন বাছা, ঘুমিয়ে পড়ো না ভাই।
এখনো শীতের শস্য হয় নি বোনা,
জ্বলে নি ভোরের সূর্যের রোশনাই।

এখনো সামনে তমসাবৃত রাতি,
প'ড়ে আছে যেন পথের জগদ্দল।
এখনো অনেক জীবনে জ্বলে নি বাতি,
জাগে নি পাখিরা, ফুটে নি নীলোৎপল।

বন্ধু আমার কলম আমার ওরে,
তুমিই অকূল আঁধারে আশার নূর।
তাইতো বুকের গভীরে রেখেছি পুরে,
উপহার যেন প্রিয়তম বন্ধুর।

কতদিন তুমি আমার শুষ্ক প্রাণে,
ঢেলেছো স্নিগ্ধ শীতল পানীয় সুধা।
শূন্য আকাশ পূর্ণ করিয়া গানে
মিটাও এবার ব্যথিত মনের ক্ষুধা।

ভিক্ষুকের বিজয় দিবস

'শূন্য ভিক্ষা-পাত্রের চেয়ে ভারী
আর কিছু নেই'—
বলেছেন কবিগুরু।
অথচ শূন্য-পাত্র হাতেই
আমার সকাল শুরু।

সকালে উঠিয়া রোজ
মনে মনে বলি :
সারাদিন আমি যেন
ভিক্ষা ক'রে চলি।

ভিক্ষা জ্ঞান, ভিক্ষা ধ্যান,
ভিক্ষাহি পরম তপঃ
যে দেয় অধিক ভিক্ষা
তারই নাম করি জপ।

সেই সূত্রে যার নাম
অগ্রে আসে তাকে
বসাই প্রভুরাসনে—
প্রয়োজনে খত দেই নাকে।

তবু নিত্য নিরন্তর
ভিক্ষালব্ধ ধনে,
উড়াই গর্বিত পুচ্ছ
গগনে-গগনে।

যাকে বলি স্বদেশের
স্বাধীন পতাকা :
সূর্য নেই, আছে তাতে
ভিক্ষাপাত্র আঁকা।

স্বাধীনতা

স্বাধীনতা আছে
জাতির উদ্দেশে
রাষ্ট্রপতির প্রদত্ত-ভাষণে,
স্বাধীনতা আছে
বেতার-টিভির
বিশেষ অনুষ্ঠানে।

স্বাধীনতা আছে
অফসেটে ছাপা
দৈনিক আর সাপ্তাহিকের
রঙিন-ক্রোড়পত্রে।

স্বাধীনতা আছে
ইস্টেডিয়ামের
গার্লস গাইড শোতে,
কচি-কাঁচা আর
ভারতেশ্বরী হোমসের
মেয়ে-নৃত্যে।

স্বাধীনতা আছে
মসজিদে, মন্দিরে
এবং বৌদ্ধবিহারে
প্রার্থনায়।

স্বাধীনতা আছে
এতিমখানায়,
জেলখানা আর
হাসপাতালের
খাদ্যসূচীর
হঠাৎ উর্বরতায়।

স্বাধীনতা আসে ঘুরে
মার্চ-পাস্ট আর
বিডিআরের
টাট্টু ঘোড়ার ক্ষুরে।

ইঁদুর

[মোহাম্মদ রফিক অগ্রপথিকেষু]

মুগুর-হাতে একদল গর্তের পাশে ওত পেতে বসো,
একদল জল ঢালো, যে-পর্যন্ত না গর্ত ছেড়ে
বেরিয়ে আসছে ইঁদুর। ওদের বেরিয়ে আসতে দাও।
বেরিয়ে এলেই বাছাধনদের মাথায় মারো মুগুর।
পশ্চিমগ্রামের রাখাল ছেলেরা এভাবেই
ধানচুরি ক'রে গর্তে-লুকানো ইঁদুরদের নিধন করে।
তারপর গর্তের ভেতর থেকে তুলে আনে
থরে-থরে সাজানো সোনালি ধানের ছড়া।

শুধুই কৃষি-গবেষকদের কাজে লাগবে ভেবে
গল্পটা বলি নি। এর অন্য একটা অর্থ আছে।
জীবনানন্দের 'ধরা যাক দু'একটা ইঁদুর এবার'—
কিম্বা বাউলদের আধ্যাত্মিক ইঁদুরের সঙ্গে এই ইঁদুরকে
গুলিয়ে ফেলাটা একেবারেই উচিত হবে না।
এ-ইঁদুর সে-ইঁদুর নয়। এর অন্য একটা অর্থ আছে।
বাংলাকাব্যে এ-ইঁদুর পূর্বে ছিল না,
তাই চর্যাপদে কিম্বা রবীন্দ্র-নজরুলে এ-ইঁদুর নেই।
এ-ইঁদুর এসেছে সম্প্রতি এই স্বাধীন বাংলায়।
কিন্তু এরই মধ্যে সে গর্ত খুঁড়েছে
আমাদের স্বপ্নের পুরো মাঠ জুড়ে।
তার বিষদাঁতে খোঁড়া মাটির ভিতরে প্রতিদিন
জন্ম নিচ্ছে বিষবৃক্ষ—
শোষণের, সন্ত্রাসের, এবং যথারীতি স্বেচ্ছাচারের।

ইতিমধ্যেই আমাদের সোনালি-শস্যের সিংহভাগ
ঢুকে গেছে সেই ইঁদুরের গর্তে।
আমাদের প্রিয়-শহীদদের মাথার খুলিগুলি
ব্যবহৃত হচ্ছে তাদের লুট করা সম্পদ সঞ্চয়ের ভূগর্ভস্থ
গোপন সিন্দুকের মতো।

আর ভস্মে ঘি ঢালবার মতই আমরা সেই গর্তে
ঢেলে চলেছি আমাদের শ্রম
ঘাম
অশ্রু
রক্ত
স্বেদ।

লুকাবার মতো ধন জুটেছে যাদের, খুব স্বাভাবিকভাবেই
তারা গেছে ইঁদুরের পক্ষে।
কেননা, তারা চায় লুণ্ঠিত সম্পদের জন্য নির্ভরযোগ্য দুর্গ।
ইঁদুরের গর্ত তো গর্ত নয়, আন্তর্জাতিক ব্যাংকের লকার।
সেই গর্তে বসেই তারা তৈরি ক'রে চলেছে
পরস্বপহরণের নীল-নক্‌শা।

এখন সময় হয়েছে চূড়ান্ত প্রত্যয়ে রুখে দাঁড়ানোর।
শুধু আটচল্লিশ ঘণ্টা নয়, প্রয়োজনবোধে
আটচল্লিশ হাজার ঘণ্টা ধ'রে রুখে দাঁড়ানোর।
এখন সময় হয়েছে গন্ডগ্রামের সেই রাখাল ছেলেদের মতো
মুগুর হাতে গর্তের পাশে ওত পেতে বসে থাকার।
এখন সময় হয়েছে ইঁদুরের গর্তে অবিরাম জল ঢালার।

তা না হ'লে আমরা আমাদের লুণ্ঠিত সম্পদসমূহ
আর কোনোদিনই ফেরত পাবো না, তা না হ'লে
আমরা আর কোনোদিনই আমাদের না-ফোটা স্বপ্নগুলি
ফোটাতে পারবো না। কোনোদিন ফোটাতে পারবো না।

এখন সময় হয়েছে নীলকরদের নীল-নক্‌শাকে
ভালোবাসার টগবগে লাল-নক্‌শায় রূপান্তরিত করবার।

কবর ও কারাগার

জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে পার্থক্য প্রচুর—
শুধু এই কথাটিই আমি বোঝাতে চেয়েছি
সারাজীবন ধ'রে।
সাড়ে তিন হাত মানুষ চার হাত কবরের মধ্যে
দিব্যি সে মানিয়ে যায়।
'বাসযোগ্য নয়'—এই অভিযোগে
কবর ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে না কেউ।
অথচ আমরা সবাই জানি,
কবর সত্যিই মানুষের বাসযোগ্য নয় ;
কবর যথার্থ অর্থেই মৃতের আবাসভূমি।

জীবিতের কবর হয় না,
তার জন্য আছে কারাগার।
সাড়ে তিন হাত মানুষের জন্য
সেখানে রয়েছে বারো হাত উঁচু দেয়াল।
চার হাতে তার চলে না।
বারো হাত উঁচু দেয়ালও সে ডিঙিয়ে যায়
মাঝে মাঝে—
তাই, কারাগারের দেয়ালের পাশেই থাকে
সদা-সতর্ক সান্ত্রী-পাহারা।

দেয়ালের এই-যে উচ্চতা, সে-জন্যেই
আমি কবরের চেয়ে কারাগার ভালবাসি।

জীবিতেরা দেয়ালের উচ্চতা দাবি করে,
জীবিতেরা দেয়ালের উচ্চতা দাবি করে,
জীবিতেরা দেয়ালের উচ্চতা দাবি করে।

মাঝে মাঝে সে-উচ্চতা স্পর্শ করে আকাশ।

জেব্রা ক্রসিং

[মুশাররাফ করিম প্রিয়বরেষু]

কাল্লা যেন কাল রাত আমার বুকের উপরে
জেব্রা-ক্রসিং এ'কে রেখে গেছে।
ঘুমিয়ে ছিলাম, তাই টের পাই নি।
ঘুম ভাঙতেই মনে হলো
আমি লিলিপুটদের দেশে শুয়ে আছি।
আমার বুকের উপর দিয়ে
এগিয়ে চলেছে মানুষের বিদ্রোহী মিছিল।

আমার বুকটা যেন উত্তপ্ত মরুভূমির মধ্যে
একখন্ড স্নিগ্ধ-মরূদ্যান।
জীপ আর ট্রাকের তাড়া-খাওয়া পথিকের
সংত্রস্ত পায়ের নিচে
যেন একান্ত নির্ভাবনাময় একখন্ড মাটি।

আমার বুকের জেব্রা–ক্রসিং-এ বসে
জনৈক শিল্পী আমার পাকস্থলির উপর
আঁকলেন একটি চমৎকার আলপনা;
শহীদ মিনারের গা-ঘেষে উঠছে লাল সূর্য।
আমি সেই সূর্যের উত্তাপে
দালির জেব্রার মতো দাউ-দাউ জ্বলছি।

আমার মনে পড়লো চিড়িয়াখানার
সেই রৌদ্রদগ্ধ ক্ষুধার্ত জেব্রাটির কথা।
কিছু-একটা খাবারের জন্য
কী দারুণ গ্রীবাই না সে বাড়িয়েছিল
আমাদের দিকে।

আমিও জেব্রার মতোই বুক বাড়িয়েছি
পৃথিবীর পোড়-খাওয়া মানুষের দিকে...

মদ-মুদ্রা-ঈশ্বর

মানুষের প্রথম সার্থক আবিষ্কার,
মদ।

মানুষের প্রথম সার্থক প্রবর্তনা,
মুদ্রা।

মানুষের প্রথম সার্থক উদ্ভাবন,
ঈশ্বর।

কবরে শেফালি

আজিমপুরের পুরনো কবরে
শরতের শেফালি
ফুটেছে।
সম্ভবত আমার মতোই মৃতেরাও
পেয়েছে সে-ঘ্রাণ,
শেফালির।
আমার মনের ভিতরে এখন
শুধু শেফালির
মেলা।

আমার সঙ্গে একাত্ম হও যদি
তুমিও পেতে পারো
সেই শেফালির ঘ্রাণ
প্রাণ ভ'রে।
তোমার কথা ভেবেই সেই ঘ্রাণ
আমি বুকে ক'রে বয়ে
নিয়ে এসেছি এই
দূর-পথটুকু।

আমি চাই তুমি তার কিছু ঘ্রাণ নাও।
তুমি কি তা চাও ?
যদি চাও এসো
প্রিয়তমা,
দেখো, এই বুকে কত শেফালির ঘ্রাণ
আছে জমা।

উন্মুক্ত সঙ্গম

মেঘবতী আকাশ জন্ম দিয়েছে কাল এক ফুটফুটে
চন্দ্রবতী-শিশু।
নবজাতকের মতো চাঁদটিকে মেঘের কাঁথায় জড়িয়ে
সে এখন শুয়ে আছে
দূরে-নীলিমায়।

সঙ্কোচে চোখ মেলে আকাশের দিকে তাকাও,
করজোড়ে স্তব করো তাকে, মাঙ্গলিক মন্ত্র বলো।
স্তবস্তোত্রে মন্ত্রমুগ্ধ ক'রে
ফের কোনো পূর্ণিমার রাতে
তাকে নিয়ে চ'লে যাও পৃথিবীর উদ্দীপক ঘাসে।
আকাশও নারীর মতো নিজের প্রশংসা ভালবাসে।

স্তবের উত্তাপে
সঙ্গমে সম্মত করো
তাকে।

যদি সে সম্মত হয় পুনরায় উন্মুক্ত সঙ্গমে;
জেনো, আবারো সে জন্ম দেবে ফুটফুটে শিশু।
আসলে তো জীবমাত্রই সন্তান-পিপাসু।

মাতৃ-ক্রোড়ে

মা খুব সুন্দর।
তার কালো চোখের সঙ্গে
পাল্লা দিয়ে বেড়ে ওঠা
দীঘল কালো চুল,
ননীর মতো সুঠাম নরোম বাহু,
লতার মতো লতিয়ে ওঠা গ্রীবা।
তার আনত যুগলস্তনে
জগতের শ্রেষ্ঠ-কোমলতা।

তুমি যতই বড় হয়ে উঠবে,
দেখবে, তোমার মায়ের সঙ্গে
কীভাবে ক্রমশ তোমার দেহের
মিলসমূহ স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

আমার সঙ্গে তোমার তেমন মিল নেই।
যতই তুমি বড় হবে, তোমার সঙ্গে
ততই বাড়বে আমার দূরত্ব।
এই সত্য সত্য মেনে নিয়ে
তোমাকে আমি রোপণ করেছি
মাতৃ-ক্রোড়ে।

শালিক পাখির গল্প

'one for sorrow, two for joy'...

—ইংরেজী প্রবাদ।

এক-এ দুঃখ, দুই-এ আনন্দ।
শালিক বলতে আমরা এরকমই বুঝি।
দুঃখ ও আনন্দের নিত্যদিনের যে দ্বন্দ্ব
সেই দ্বন্দ্বের মধ্যে জন্ম হয়েছে শালিক পাখির।
দুঃখ যখন জয়ী হয়, কোথা থেকে যেন
ফুরুৎ ক'রে একটি শালিক উড়ে আসে।
প্রবল উৎকণ্ঠা নিয়ে আমরা অপেক্ষা করি
দ্বিতীয় শালিকটির জন্য।
কখনো সে আসে, কখনো আসে না।
যখন আসে, আনন্দে আমাদের মন ভ'রে যায়,
মনে হয় আনন্দ আসছে তার পিছু-পিছু।
যখন আসে না, সম্ভাব্য দুঃখের কথা ভেবে
তখন আমাদের মন কেমন ক'রে ওঠে।

কিন্তু আজ ঘটলো অন্যরকম একটা ঘটনা।
হোটেলের নির্জন-কক্ষে বসে আছি একা;
মন ভালো নেই। ভেবে চলেছি, নেহাৎই
না-ভেবে বসে থাকা সম্ভব নয় ব'লে।
এমন সময় কোথা থেকে যেন উড়ে এলো
একটি ছোট্ট শালিক পাখি।
উড়ে এসে সে বসলো ভোরের বারান্দায়।
বসেই ভয়ে ভয়ে তাকালো আমার দিকে।
আমার অভয় পেয়ে, তার চমৎকার দুটো
হলুদ পায়ের উপর ভর রেখে, সে বসলো
তার সদাসতর্ক ডানা দুটো গুটিয়ে।
অধীর আগ্রহে দ্বিতীয়টির জন্য অপেক্ষা
করছি আমি, আর মনে-মনে আবৃত্তি করছি :
'one for sorrow, two for joy'...
কিন্তু না, দ্বিতীয়টির আর দেখা নেই।
আসন্ন দুঃখের আশংকায় মনটা যখন

প্রায় প্রস্তুত হয়ে এসেছে—
তখন বারান্দার চাতালে জমে থাকা
এইটুকুন জলের মধ্যেই শালিকটি তার
তৃষ্ণার্ত চঞ্চু ডুবিয়ে, আধ-বোজা চোখে
পরমতৃপ্তিতে নিবৃত্ত করলো চৈত্রের জলতৃষ্ণা।
প্লেট ধুয়ে আমিই জলটা ফেলেছিলাম একটু আগে,
সেই অপ্রয়োজনীয় ময়লা জলটাই
শালিকটার এতো প্রয়োজনে লাগবে, ভাবি নি।
আনন্দে আমার মনটা কখন যে এতোটা
ভ'রে উঠেছে, টের পাই নি নিজেই।

স্নিগ্ধ-হাওয়া এসে লাগলো আমার গায়ে।
জলতৃষ্ণা মিটিয়ে শালিকটি তখন ডানা মেলে
উড়ে গেলো দূরে কোথায়।

তুমি নেই,নতুন ক'রে মনে পড়লো সে-কথা।
কিন্তু তোমার না-আসার সঙ্গে
দ্বিতীয় শালিকটির না-আসাকে মিলিয়ে
আজ আর দুঃখ পেলাম না আগের মতো।
মনে হলো প্রত্যেকেরই একটা নিজস্ব জগৎ আছে,
তোমার, আমার...এবং ঐ ছোট্ট শালিক পাখিটার।

ছুটি

[হেলাল হাফিজ কল্যাণীয়েষু]

ললিত দা, তুমি ছুটির ঘন্টা বাজাও।
ঢং ঢং ক'রে বাজুক তোমার সেই
পৃথিবী-কাঁপানো ঘন্টা,
ছোটবেলায়, বারহাট্টার সেই দিনগুলোতে
ষন্ডামার্কা কাঠের হাতুড়ি দিয়ে
তুমি যেমন ক'রে বাজাতে বেলটিকে।

তুমি পিতলের গোল-বেলটাকে বাজাতে,
ক্লাসের লাস্ট-বেঞ্চ থেকে মাস্টার মশাইর
চোখ ফাঁকি দিয়ে আমি দেখতাম।
মনে হতো পৃথিবীটাকে হাতুড়ি বানিয়ে
তুমি পেটাচ্ছো সূর্যের লৌহপিন্ডখানি।
রক্ত পাগল করা সেই ঘন্টা-ধ্বনিতে
তুমি ঘোষণা করতে বিশ্বব্রহ্মান্ডের ছুটি।

সবার আগে ছুটি হতো আমার।
কেননা, আমার উৎকর্ণ দৃষ্টি
সর্বদা নিবদ্ধ থাকতো তোমার উদ্দেশে,
শিশুর কান্নার প্রতি যেমন মায়ের।

ললিত দা, তিরিশ বছর আগের সঙ্গে
তিরিশ বছর পরের পার্থক্য বুঝি
এতোই প্রবল ? বুঝি এতোটাই বেশি ?
আমাদের প্রাত্যহিক ছুটির ঘন্টাটি
বাজাতে-বাজাতে হঠাৎ কখন তুমি
নিজেই নিজের ছুটি ঘোষণা করেছো।

তুমি চ'লে গেছো দূরে, যেখানে পৃথিবীর
চ'লে-যাওয়া মানুষের ভিড় বাড়ছে ক্রমশ।

যাবার সময় তুমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেছো
আমাদের ছুটির ঘন্টাটি।

আমাদের ছুটি এখন তোমার হাতে বাঁধা।

তুমি আবার বাজাও তোমার ঘণ্টা।
গাছের পাতা ঝরিয়ে-কাঁপিয়ে,
দুপুরের রোদে ছুরির ঝিলিক তুলে,
নদীর জলে চঞ্চল ঢেউ জাগিয়ে,
হাহাশ্বাস ছড়িয়ে হাওয়ায়
তোমার বিশ্ব-কাঁপানো ঘণ্টা আবার বাজুক।

না হয় তুমি দূরের থেকেই বাজাও,
আমিই একা শুনি।

মৃত্যু, জীবনের শ্রেষ্ঠ কবিতা

'সত্যাকার ভালোবাসা বোঝা যায় মৃত্যুর প্রেক্ষিতে'…
—রিলকে

*

কখনো কখনো ভালোবাসা মৃত্যু সেজে ডাকে।
তখন জীবন ও অ-জীবনের মাঝের দেয়ালখানি
দুলে ওঠে নাটমঞ্চের তরঙ্গিত আলো-আঁধারিতে।

কী প্রচণ্ড আদিমউল্লাসে ফেটে পড়ে দেহের বল্কল।

সূর্য-ডোবা রাঙা-গোধূলিতে
আমি দেখতে পাই চিরদিনের সেই অস্পষ্ট পৃথিবী।
হঠাৎ তখন আমাকে প্রার্থনা করে আমার মরণ।

আমিও সহজ মনে মানি তার দাবির সত্যতা।
ভাবতে ভালোই লাগে, মৃত্যু এসে তুলে দেবে
জীবনের পাশ থেকে যাবতীয় দুঃখের দেয়াল।
তার ছোঁয়া পেয়ে আরো চমৎকার, আরো সুন্দর
হয়ে উঠবে জীবন নামের এই অদ্ভুত জিনিসটা।

জীবন সুন্দর, মৃত্যু কেন ভিন্ন হতে যাবে ?
জীবনের মতোই সে-ও ভালবাসে মানুষের দেহ।
মানুষের দেহ ভিন্ন অর্থহীন মৃত্যুর কল্পনা।
জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে মানুষও প্রার্থনা করে তাকে।
এতদিন সে ছিল অজ্ঞাত প্রার্থনা,
আজ তাকে তুলে আনো জ্ঞানের ভিতরে।
তাকে মানো, ভালবেসে তাকে জীবনের পাশে টানো।

মানুষের সবকিছুই মানুষের প্রিয়—
মৃত্যু, সে-ও মানুষেরই প্রিয়-আবিষ্কার।
সে-ও সত্য, সুন্দর জন্মের মতো, জীবনের মতো।
তাকেও জড়িয়ে নাও জীবনের সঙ্গত-বিস্তারে,
রাতের আঁধার যেভাবে জড়িয়ে নেয় ভোরের আলোকে।

তোমার বামে সন্ধ্যা, দক্ষিণে প্রভাত।
মৃত্যু এ-দুইকে মিলিয়ে দেবে অসীম আকাশে।

জীবনের পাত্র পূর্ণ ক'রে মৃত্যুকে সাজিয়ে দাও
অন্তিমসম্ভারে। তারপর মৃত্যুর শিয়রে বসে
তুমি লেখো তার অপার ঐশ্বর্য-গাথা,
লেখো মৃত্যু, জীবনের শ্রেষ্ঠ কবিতা।

আফ্রিকার প্রেমের কবিতা

যে-বয়সে পুরুষ ভালবাসে নারীকে—
সে-বয়সে তুমি ভালবেসেছিলে তোমার মাতৃভূমি,
দক্ষিণ আফ্রিকাকে।

যে-বয়সে পুরুষ প্রার্থনা করে প্রেয়সীর বরমালা,
সে-বয়সে তোমার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়েছে ফাঁসির রজ্জুতে।
যে-বয়সে পুরুষের গ্রীবা আকাঙ্ক্ষা করে
রমণীর কোমলবাহুর বাগ্র মুগ্ধ আলিঙ্গন—
সে-বয়সে তোমাকে আলিঙ্গন করেছে
মৃত্যুর হিমশীতল বাহু।

তোমার কলম-নিঃসৃত প্রতিটি পঙ্‌ক্তির জন্য
যখন তোমার প্রাপ্য ছিল প্রশংসার হীরকচুম্বন,
তখন তোমার প্রাপ্য হয়েছে মৃত্যুহীরক বিষ।

তোমার কবিতা আমরা একটিও পড়ি নি আগে,
কিন্তু যেদিন ওরা তোমাকে রাতের অন্ধকারে
ফাঁসিতে ঝোলালো—
তার পরদিন সারা-পৃথিবীর ভোরের কাগজে
ছাপা হলো তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ কবিতা।

আমরা জানলাম, কী গভীরভাবেই না তুমি
ভালবেসেছিলে তোমার প্রিয়তম মাতৃভূমিকে।
আমরা জানলাম, কালো-আফ্রিকার শ্বেত-শত্রুদের বিরুদ্ধে
কী ঘৃণাই না ছিল তোমার বুক জুড়ে, শোণিতে-হৃদয়ে।

আমরা জানলাম, শুধু শব্দ দিয়ে নয়, শুধু ছন্দ দিয়ে নয়,
কখনো-কখনো মৃত্যু দিয়ে লেখা হয় অমর কবিতা।

তুমি কবি, বেঞ্জামিন মোলয়েস, তুমি মৃত্যু দিয়ে
কবিতাকে বাঁচিয়ে দিয়েছো তার মৃত্যুদশা থেকে।
বেঞ্জামিন মোলয়েস, তুমি এখন সারা-বিশ্বের কবি,
তোমার মা এখন পৃথিবীর তাবৎ-কবিদের জননী।

তোমার জন্মভূমি, দক্ষিণ আফ্রিকা এখন পৃথিবীর
তাবৎ-কবিদের শৃংখলিত মাতৃভূমি।

কারাগারের ফটকে নেলসন মেন্ডেলার পত্নী যখন
তোমার শোকাতুরা মাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন,
তখন, মোলয়েস, তখন তোমার মায়ের পুত্রশোকদগ্ধ
বুকের উদ্দেশে পৃথিবীর সর্বকালের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি
ছুটে গিয়েছিল;
এবং মাথা নত ক'রে তারা ফিরে এসেছিল লজ্জায়—
তোমার সাহসের যোগ্য হয়ে উঠবে ব'লে।
তোমার ভালোবাসার যোগ্য হয়ে উঠবে ব'লে।

আমার সমস্ত কবিতাগুলি তোমার উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানাতে
আজ সারাদিন মাথা নত ক'রে নীরবতা পালন করেছে।
এই মধ্যরাতেও আমাকে কলম হাতে
জাগিয়ে রেখেছো তুমি।

বেঞ্জামিন মোলয়েস, তুমি একটুও ভেবো না,
তোমার অপূর্ণ স্বপ্নসমূহ বুকে নিয়ে
আমরা জেগে আছি এশিয়ায়—
তুমি আফ্রিকার মাটিতে ঘুমাও।

ফিরে এসো, নিরঞ্জন

মৃত্যুতেও থামে না উৎসব—
জীবন এমনি প্রচণ্ড, প্রচুর।

তাইতো কংশের জলে মুখ ধুয়ে
নিরঞ্জন ফিরে আসে, নক্ষত্রের
সোনালি আগুনভরা রাতে।
কল্লোলিত জীবনের হাতে
হাততালি দিয়ে ফের হেসে ওঠে
সূর্যের চুম্বনে ধাক্কা খেয়ে
রুপালী গর্জনে যেরকম
ফোঁসে রুদ্র সমুদ্রের ঢেউ।

শিশুর দাঁতের মতো পবিত্র জীবন
নিয়ে এসেছিল নিরঞ্জন।
নিরঞ্জন ছিল শুক্লপক্ষের প্রতীক।
পরাজয় মানে না যে জন,
পরাভব মানে না যে প্রাণ,
সেই শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞান
তার অভ্যন্তরে ছিল দীপ্যমান।

তবু বৈরী-সময়ের বিষ
তার সমস্ত ওংকার মুখে
ছড়িয়েছে বিতৃষ্ণার কৃষ্ণপক্ষ ছায়া।
তার স্বপ্নগৃহ ভস্মীভূত হয়ে গেছে
দুঃস্বপ্নের খাণ্ডবদহনে।
সে এখন স্বপ্নভস্ম ছড়াতেছে
পৃথিবীর পথে।

এই মূর্খ অবিবেকী পৃথিবীর সাথে
কেন হেন অভিমান ?
মানুষ তো আজো সেই অবুঝ শিশুটি,
খেলনা পুতুলগুলিকেই
চূড়ান্ত ঐশ্বর্য ভেবে

যে শুধু আগলে রাখে হিংসুটের মতো।

তার সাথে অভিমান?
এ-পৃথিবী তোমাকে বোঝার মতো
প্রাজ্ঞ হোক আগে,
তারপর তাকে শাস্তি দিয়ে
তুমি চ'লে যেও চির-পৃথিবীতে।
তার আগে নয়।

যদি মনে হয় ছল ক'রে বাঁচা
তবে তা-ই হোক,
তবু তুমি এখন যেয়ো না।
নিরঞ্জন ফিরে এসো, ফিরে এসো,
ফিরে এসো ভাই।

আবার কংশের জলে মুখ ধুয়ে
ফিরে এসো জীবন-গঙ্গায়,
সঙ্গমে,
সংগ্রামে,
জীবনের অশেষ-বিস্ময়ে,
সুখে-দুঃখে, আনন্দে-বেদনায়।

ফিরে এসে রাজপথে আবার দাঁড়াও,
ভোরের হাওয়ায় বুক ভ'রে
প্রচণ্ড নিশ্বাস টেনে বলো :
'চমৎকার, কী দুর্দান্ত চমৎকার
এই মনুষ্য-জীবন ......।'